সামাজিকীকরণ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজ পরিবর্তন

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ নির্ণয় করব। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধের মধ্যে কোনগুলো আমরা বিদ্যালয়ে চর্চা করি তা নির্ধারণ করব। এরপর সামাজিকীকরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় মানুষ কীভাবে এবং কেনো প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ শেখে এবং চর্চা করে তা জানব। সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো কীভাবে প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে পরিবর্তন করতে পারে তা জানব। এরপর বিদ্যালয়ে শেখা কিছু প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ আমরা নির্ধারণ করব যা আমরা সমাজে চর্চা করতে চাই।

আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে ইতোমধ্যে রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। তাই প্রথমেই আমরা একটি কাজ করব। আমরা এই শিখন অভিজ্ঞতার জন্য নতুন করে একটি দল গঠন করি।

দলগত কাজ ১:

প্রতি দলে ৫ থেকে ৬ জন থাকবে। দলে আলোচনা করে আমরা আমাদের সমাজের কয়েকটি প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ নির্ণয় করে একটি তালিকা তৈরি করি।

অনুশীলনী কাজ ১:

আমার সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ

১.নিয়মিত প্রার্থনা করা।
২.অসহায়দের সাহায্য করা।
৩.অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন।
৪.অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া না নেওয়া।
৫.পরিবারের অসুস্থ সদস্যদের সেবা করা।

অনুশীলনী ১ এর কাজটি করার পর আমরা দলে আলোচনা করে নির্ধারণ করি আমাদের সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধের কোনগুলো আমরা বিদ্যালয়ে চর্চা করি।

অনুশীলনী কাজ ২:

আমার বিদ্যালয়ে চর্চা করা হয় সমাজে প্রচলিত এমন রীতিনীতি ও মূল্যবোধ

১.শিক্ষক ক্লাসে ঢুকলে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

২.ঐক্যবদ্ধ থাকা।

৩.অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া না নেওয়া।

৪.দেশকে ভালোবাসা।

৫.পথশিশুদের খাবার দেওয়া।

৬.বন্ধুদের সাথে খাবার ভাগাভাগি করে খাওয়া।

৭.বড়দের সালাম দেওয়া

৮.ছোটদের স্নেহ করা।

৯.বড়দের পায়ে ডান হাত দিয়ে সালাম করা।

১০.জিনিসপত্র ডান হাত দিয়ে দেওয়া-নেওয়া করা।

অনুশীলনী কাজ ১ ও অনুশীলনী কাজ ২ হয়ে গেলে প্রতি দল থেকে ১ বা ২ জন আমরা দলীয় কাজ উপস্থাপন করব।

আচ্ছা আমরা একটু কল্পনা করে দেখিতো আমরা যদি কোনো পরিবারে লালিত-পালিত না হয়ে কোনো বন-জঙ্গলে বন্য প্রাণীদের সান্নিধ্যে বেড়ে উঠতাম, তাহলে কী হতো? কী খুব অবাক লাগছে? চলো, আমরা ইংরেজ লেখক রুডিয়ার্ড কীপলিংয়ের বিখ্যাত 'দ্য জাংগল বুক' গল্পটার সংক্ষেপ পড়ে নিই।

বনে হারিয়ে যাওয়া মুগলি

গল্পের মূল চরিত্রের নাম মুগলি। সে জন্মের পরপরই ভারতীয় এক জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিল। সে জানত না তার মাতা-পিতা কারা, তারা দেখতে কেমন। মাতা-পিতার সংস্পর্শ ছাড়া মুগলি বেড়ে ওঠে জঙ্গলে। তাকে বড়োো করে তুলেছিল কে জানো? একদল নেকড়ে। সে নেকড়েদের মতো করেই জঙ্গলের জীবনে মানিয়ে নিয়েছিল। মুগলি একমাত্র মানুষ হিসেবে সেখানে বসবাস করত। বনে তো মানুষের জন্য অনেক বিপদ-বাধা ছিল। শেরশাহ নামক মানুষ খেকো এক বাঘের কবল থেকে মুগলিকে রক্ষা করার জন্য বাঘীরা নামের চিতাবাঘ কিছু পশু বন্ধুর সঙ্গো মিলে তাকে কাছেই এক গ্রামে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে মুগলি ছোটোবেলা থেকে বেড়ে উঠেছিল জঙ্গলে। নেকড়ের দল এবং অন্যান্য পশুপাখিদের সে তার পরিবার-পরিজন হিসেবে জেনে এসেছে। নেকড়ে দলের মাধ্যমে তার সামাজিকীকরণ হওয়ায় এর আচার-ব্যবহার সবকিছুতেই তার প্রভাব ছিল, যা মানুষের আচরণ ও সমাজের সঙ্গো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মুগলি, বাঘীরার সিদ্ধান্তে তাই জঙ্গল ছেড়ে যেতে চায়নি। যাহোক অন্য মানুষের সংস্পর্শে গিয়ে তার মনোভাব পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে তার সমবয়সী এক সঙ্গী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁদের সংস্পর্শে এসেই মুগলির সামাজিক ব্যবহার, আচার-আচরণ, আবেগ, অনুভূতির যথাযথ বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে শুরু করে। সমাজের একজন হওয়ার জন্য মুগলিকে মানুষের জীবনাচরণ শিখে নিতে হয়েছিল। একে বলা হয় পুণঃসামাজিকীকরণ।

এটি যদিও নিছক গল্প, কিন্তু মানুষের জীবনে সামাজিকীকরণের গুরুত্ব বোঝার জন্য একটি চমৎকার উদাহরণ। শুধু গল্পে নয়, বাস্তব জীবনেও সামাজিকীকরণ না হলে কী ঘটে তা জানা যায় বিভিন্ন সত্য ঘটনার আলোকে। চলো, এবার আমরা এরকম একটা সত্য ঘটনা জানব। ১৯২০ সালে ভারতের গোদামুরি গ্রামের নিকটবর্তী জঙ্গলে এক ধর্মপ্রচারক দম্পতি স্থানীয় লোকজনের কিছু কথাবার্তার ভিত্তিতে অনুসরণ করে জঙ্গলে গিয়ে এক গুহায় কিছু নেকড়ের সঙ্গে থাকা দুটি মানব শিশুকে উদ্ধার করেন। এদের নাম দেন অমলা ও কমলা। তারা জন্মের পর থেকেই নেকড়দের সঙ্গে বড়ো হওয়ায় মুগলির মতো তাঁদেরও প্রাথমিক সামাজিকীকরণ হয়নি। তারা নেকড়েদের মতোই নির্দিষ্ট সময়ে চিৎকার করত, চার পায়ে চলাচল করত এবং অন্যান্য আচার-আচরণেও নেকড়েদের প্রভাব ছিল দৃশ্যমান। তারা কাঁচা মাংস খেত। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরানো হলেও তারা তা খুলে ফেলতে চাইতো; উদোম শরীরে থাকতে চাইতো। যখন তাঁদের উদ্ধার করা হয়, তখন অমলার বয়স ছিল দুই বছর, আর কমলার বয়স ছিল আট বছর । কিন্তু তাঁদের আচার-আচরণ দেখে মনে হত যেন তারা মাত্র ছয় মাসের মানব শিশু। মানুষের আচার-আচরণ শিখিয়ে তাঁদের সমাজের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। তবে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করার কয়েক মাসের মাঝে অমলা মারা যায়; আর কমলার মৃত্যু হয় ১৭ বছর বয়সে ১৯২৯ সালে। মৃত্যুর আগে কমলা কিছুটা হলেও মানব আচরণ শিখেছিল। সে দুই হাতে খেতে পারত, কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে পারত। অমলা কমলার ঘটনায় প্রমাণিত হয় আসলে বংশগত বৈশিষ্ট্য নয়, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শিশু আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, ও মূল্যবোধ শেখে।

মানুষের সংস্পর্শে এসে কমলা কিছুটা মানুষের মতো খেতে অভ্যস্ত হয়

সামাজিকীকরণ

মানুষ মাত্রই সামাজিক জীব তা আমরা ছোটোবেলা থেকে জেনে এসেছি। কিন্তু কেন তা বলা হয় তা আমাদের জানা দরকার। একজন মানবশিশু জন্মমাত্রই সামাজিক প্রাণীতে পরিণত হয় না। তাকে বেড়ে ওঠার পাশাপাশি সমাজের নিয়ম-নীতি ও মূল্যবোধগুলো শিখে সমাজের একজন হয়ে উঠতে হয়। যেহেতু একজন ব্যক্তি একা একা তার চাহিদা পূরণ করতে পারে না, তাই তাকে দলবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করতে হয়। সেজন্য একজন মানুষকে তার নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতিকে বুঝতে এবং সে অনুযায়ী আচার-আচরণ করতে হয়।

সামাজিকীকরণ হলো একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সমাজের আকাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ, রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও দক্ষতাসমূহ আত্মস্থ করে সফলভাবে সমাজের একজন হতে শেখে। প্রতিটি সমাজেরই বেশ কিছু নিজস্ব বিশ্বাস, নিয়ম-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি থাকে যা ওই সমাজের সকল সদস্যের মেনে চলতে হয়। সামাজিকীকরণ আমাদের এসব সামাজিক গুণ শেখায় এবং অন্যের কাছ থেকে আমরা কী ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করব, তাও শেখায়। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় আমরা সমাজের একজন সদস্য হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলি। সমাজ ও মানুষ একে অপরকে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে গ্রহণ করে নেয়। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া একজন মানুষের ছোটোবেলা থেকে শুরু করে সারাজীবন চলমান থাকে।

জীবনের একেক স্তরে সামাজিকীকরণ একেক রকম হয়। একজন শিশু যেমন করে শেখে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক সেভাবে শেখে না। সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলো বয়সভেদে ভিন্ন হয়। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও বিদ্যালয় সামাজিকীকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু দল বা প্রতিষ্ঠান নয়, চারপাশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা, টেলিভিশন, পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন, সামাজিক যোগাযোগ ও মাধ্যম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

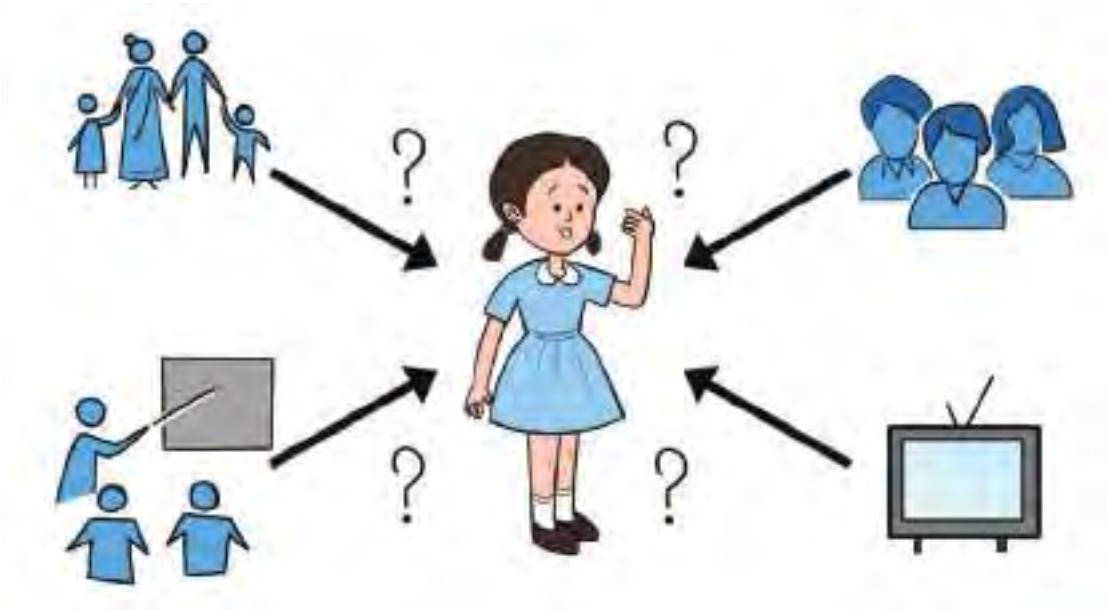

একজন ব্যক্তির সামাজিকীকরণের মাধ্যমসমূহ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সমাজের রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে স্থানান্তর হয়। সামাজিকীকরণ সংঘটিত হয় একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে; অর্থাৎ দেশ বা সমাজ ভেদে একজন ব্যক্তির নিকট প্রত্যাশিত আচার-আচরণ ভিন্ন হয়। বাংলাদেশে বসবাসরত মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের আচরণের পার্থক্যের মূল কারণ হলো সামাজিকীকরণের ভিন্নতা। একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ, ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে আমাদের আশপাশের পরিবেশ ও মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে। ব্যক্তিত্ব হল একজন মানুষের মনোভাব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারের ধরন। একজন মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা তৈরি হয় তাঁদের মিথস্ক্রিয়ার ধরনের পার্থক্যের জন্য।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ

সামাজিকীকরণ সংঘটিত হয় সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা দলের মাধ্যমে, আমরা এগুলোকে সামাজিকীকরণের মাধ্যম বা বাহন বলি। এবার চলো, আমরা সমাজিকীকরণের বাহনসমূহের সঙ্গে পরিচিত হই এবং বোঝার চেষ্টা করি মানুষকে সামাজিক প্রাণীতে রুপান্তরে সেগুলোর অবদান।

পরিবার: শিশু জন্মের পরপরই তার মাতা-পিতা ও পরিবারের অন্যদের মাধ্যমে তার চারপাশকে বোঝার চেষ্টা করে। তখন সে মূলত প্রাথমিক আচরণ করতে শেখে। মুখে কিছু কিছু আওয়াজ করে যা তার প্রাথমিক ভাষা। তার মাঝে আবেগ, অনুভূতি ও মানবিকতার বিকাশ ঘটতে শুরু হয়। শিশুমাত্রই অনুকরণপ্রিয় হয়ে থাকে। তাই পরিবার-পরিজন শিশুর আশপাশে কী আচার-আচরণ করে তা গুরুত্বপূর্ণ। আবার শিশুর আচরণ বা কর্মকান্ড দেখে মা-বাবা ও অন্যরা কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, তার দ্বারাও শিশুর আচরণ প্রভাবিত হয়। আর এর মাধ্যমেই তার মাঝে মানবিক মূল্যবোধ এবং অন্যান্য সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সামাজিকীকরণের দ্বিতীয় প্রধান বাহন রূপে কাজ করে। পরিবারের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা শিশুর ছোটো সামাজিক জগৎ কে সম্প্রসারিত করে তোলে একটি বিদ্যালয়। এখানে একজন শিশুর সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে আসা শিশু ছাড়াও অন্যান্য মানুষের পরিচয় ঘটে। শিশু হলেও তারা কিন্তু অনুধাবন করতে শেখে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রেণিকক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেতভাবে জাতীয় সংগীত গায়, একসঙ্গে ওঠাবসা ও খেলাধুলা করে। এতে তাঁদের মাঝে শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, নিয়মানুবর্তিতা, সহমর্মিতাসহ নানা গুণাবলি বিকশিত হয়।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে জ্ঞানের সঞ্চারণ করেন না। পরিবেশ বা অবস্থা থেকেও শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নানা বিষয় আত্মস্থ করে থাকে। খেলাধুলার ফলে তাঁদের দৌড়ানো, লাফঝাঁপ ইত্যাদি সক্ষমতা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি শৃঙ্খলা, সহযোগিতা ও নিয়মানুবর্তিতার মতো প্রয়োজনীয় গুণাগুণ অর্জিত হয়। সেইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও নেতৃত্বের গুণাবলিও বিকশিত হয়।

সমবয়সী সঙ্গী: পরিবারের পরপরই মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ঠাট্টা-মশকরার সঙ্গী হয়ে ওঠে একই বয়সের খেলার সাথী, সহপাঠী বা সমবয়সী বন্ধু। নিজেদের মাঝে প্রাণ খুলে, বাধাহীনভাবে মনের কথা বলা যায় একে অপরের সঙ্গে। সমবয়সী সঙ্গী বলতে আমরা এমন একটি সামাজিক দলকে বুঝে থাকি, যাঁরা প্রায় একই বয়সের এবং সামাজিক অবস্থান ও আগ্রহের জায়গায় তাঁদের মধ্যে মিল থাকে। প্রাকৃতিকভাবেই শিশু এসময় শেখে কীভাবে তার সমবয়সী গোষ্ঠীর সাঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। নিজের ধ্যান-ধারণা বা অনুভূতিকে লালন করে এ সময়টা শিশুরা নিজেদের মধ্যে নিজেকে সমাজের একজন করে গড়ে তোলে। সকলে একই বয়সের হওয়ায় ও নিয়মিত মিথস্ক্রিয়ার ফলে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা বা সংহতি পরিলক্ষিত হয়।

গণমাধ্যম: গোটা বিশ্বের সকল মানুষ প্রতিদিন তার কিছুটা সময় ব্যয় করে গণমাধ্যম ব্যবহার করে। আগেকার জনপ্রিয় গণমাধ্যম ছিল পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন। বর্তমানের জনপ্রিয় গণমাধ্যম হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো। যেমন: ইউটিউব, টুইটার বা ফেসবুক। এসব গণমাধ্যম বর্তমানে সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা নতুন গণমাধ্যমকে জনপ্রিয় করেছে। এ নতুন গণমাধ্যম আমাদের চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ গঠন ও আচরণে সর্বব্যাপী প্রভাব ফেলছে। আমাদের বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলছে। এসব প্রভাব সব সময় ইতিবাচক নয়, আমরা বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষ্য করি।

কর্মক্ষেত্র: আমরা জেনেছি যে, সামাজিকীকরণ আজীবন অব্যাহত থাকে। নতুন চাকরি শুরু করার সময় শুধু নিয়োগকর্তা কী ধরনের কাজের প্রত্যাশা করেন তা জানলেই হবে না; সেই সঙ্গে সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে মানিয়ে নেয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে নতুন রীতিনীতি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে একজন ব্যক্তির মাঝে সামাজিকীকরণ ঘটে থাকে। কাজের পরিবেশে বা সহকর্মীদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এভাবেই একজন ব্যক্তিকে ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। একইভাবে, আমরা কী ভেবে দেখেছি, আমরা কেনো পরিবার বা স্কুলের নিয়মকানুন, রীতিনীতি মেনে চলি? কখনো কী ভেবেছি এসব রীতিনীতি না মেনে চললে কী হবে? অনেক প্রশ্ন এখন হয়তো আমাদের মনে উঁকী দিচ্ছে। চলো, তাহলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আমরা কিছু জেনে নিই।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

সমাজে বসবাসরত ব্যক্তিদের চিন্তা-ভাবনা ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা হলো সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। এর ফলে সমাজের সদস্যরা কিছু প্রচলিত মূল্যবোধ, রীতিনীতি এবং রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে বাধ্য হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মানুষকে একই ধরনের আচরণ করতে উৎসাহ দেয়। যার ফলে সমাজের শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং আমাদের মধ্যে একাত্মতাবোধ তৈরি হয়।

আমরা নিজেরা যেমন সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ মেনে চলি, তেমনি আশা করি যে অন্যরাও তা করবে। কোনো রকম ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই আমরা প্রতিদিনকার জীবনে অসংখ্য সামাজিক নিয়ম, বিধি-বিধান ও আইন-কানুন মেনে চলি বা মানতে বাধ্য হই কারণ ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহ আশা করে যে, আমরা তা মেনে চলব। আর আমরা যদি তা মেনে চলি তাহলে সমাজ আমাদেরকে 'ভালো মানুষ' হিসেবে জানবে এবং এতে আমরা নানানভাবে উপকৃতও হব। আর যদি কেউ সমাজের কাঙ্ক্ষিত আচরণ না করে তাহলে মানুষ তার নিন্দা করবে এবং সেজন্য সে শাস্তিও পেতে পারে। ভালো কাজের জন্য পুরস্কার, আর 'মন্দ' কাজের জন্য শাস্তির মাধ্যমে সমাজ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর ভিন্নতাকে বিবেচনা করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়।

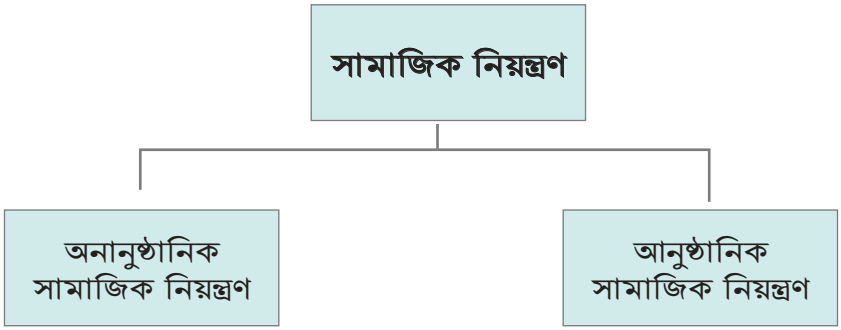

অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ:

সমাজের রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ না মানলে পরিবার, সমবয়সী বন্ধু বা সহপাঠীরা যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায় তাকে আমরা অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলি। কেউ যদি প্রচলিত নিয়ম-কানুন ও আচার-আচরণ না করে তখন পরিচিত ও অপরিচিত মানুষেরা হাসি-তামাশা, ঠাট্টা বা মস্করার মাধ্যমে তার বিরোধিতা করে। তাই আমরা কেউই চাই না আমাদের আচরণের মাধ্যমে অন্যদেরকে সমালোচনার সুযোগ দিতে।

আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

আনুষ্ঠানিক সমাজ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে প্রাতিষ্ঠানিক এজেন্ট যেমন পুলিশ কর্মকর্তা, বিচারক, স্কুলের প্রশাসক বা চাকরিদাতারা। যখন অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ কাজ করে না তখন আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজ নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসে। সব দেশে বা সমাজেই দেখা গেছে কিছু মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-বিধান ও আইন-কানুন মানে না। এ ধরনের আচরণকে অপরাধ বলা হয়। কেউ অপরাধ করলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সমাজ নানান রকম শাস্তি দিয়ে থাকে। শাস্তি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন: আর্থিক জরিমানা, কারাদণ্ড বা চাকরিচ্যুতি। এ সমস্ত শাস্তির ব্যবস্থা একদিকে যেমন অপরাধীদের ভবিষ্যতে বিভিন্ন অপরাধ থেকে নিবৃত রেখে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে, আবার সুনাগরিকসহ সকল নাগরিকের জন্যও অপরাধ থেকে বিরত থাকার বার্তা দেয়।

পরিবার বিভিন্ন সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে

সমাজ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি দেশকে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করা হয়। যেমন: বাংলাদেশকে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন/পৌরসভা এবং ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মূলত সমাজে বিচ্যুত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের এই প্রচেষ্টা।

সরকারের বিভাগসমূহ:

সরকার তিনটি বিভাগের মাধ্যমে কাজ করে—

আইন বিভাগ : আইন তৈরি ও সংশোধন করা।

শাসন বিভাগ : রাষ্ট্রের মধ্যে আইনকে প্রয়োগ করা।

বিচার বিভাগ : কেউ আইন ভঙ্গ করলে তার বিচার করা।

তবে শাসন বিভাগকে সরকারের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। সেসব কথাও তোমরা অন্য অধ্যায়ে জানতে পারবে।

সামাজিক পরিবর্তন

সমাজ স্থিতিশীল কোনোকিছু নয়, বরং সর্বদা পরিবর্তনশীল। 'সম্প্রদায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা' (Communal Society) ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনের মাধ্যমেই আজকের আধুনিক 'সংঘ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা'(Associational Society) তৈরি হয়েছে। 'সম্প্রদায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা'য় সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ও সংহতি ছিল অত্যন্ত নিবিড় ও আন্তরিকতাপূর্ণ। সে সমাজে এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পার্থক্য ছিল খুবই কম, সকলেই ছিল প্রায় একই রকম আচার-আচরণ ও চিন্তাচেতনা এবং মূল্যবোধের অধিকারী। এখানে ব্যক্তির ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার তুলনায় সম্প্রদায়ের মঙ্গল ও ইচ্ছাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই সম্প্রদায়গুলো পরিবারের মতো কাজ করে। এখানে কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের মধ্যে সংকট তৈরি হলে পুরো সমাজের মধ্যে তা ছড়িয়ে যায় এবং সম্প্রদায়ের কল্যাণে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সেটি সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

'সম্প্রদায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা'র বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তিত হয়ে তৈরি হয়েছে আধুনিক 'সংঘভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা'। এটি সম্প্রদায়ভিত্তিক সমাজের বিপরীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই সমাজ ব্যবস্থায় সদস্যদের মধ্যে চিন্তায়, আচরণে, মূল্যবোধে তেমন মিল নেই। এই ধরনের সমাজের সদস্যরা যতটা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে, ততটা সমাজের মঙ্গলের দিকে নয়।

সামাজিক পরিবর্তন বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হল সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। সময়ের পরিবর্তনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোরও (প্রযুক্তি, মূল্যবোধ ইত্যাদি) পরিবর্তন সাধিত হয় যার ফলে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও পরিবর্তন আসে। পরিবর্তন সব সময় ইতিবাচক নাও হতে পারে, সংস্কৃতির উপাদানগুলোর নেতিবাচক পরিবর্তনের কারণে সমাজের সমস্যা বা অবক্ষয় সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। আবার সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার আকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবনের ফলে একদিকে যেমন মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার কমেছে, আবার মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। জনসংখ্যার তারতম্যের ওপর সামাজিক পরিবর্তন নির্ভর করে। নতুন ধারণাও সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তন

বাংলাদেশেও সমাজকাঠামোতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সমাজকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পরিবারে আমরা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করি। এক সময় আমাদের দেশে যৌথ পরিবারের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু যৌথ পরিবার আস্তে আস্তে একক পরিবারে রুপান্তরিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে পরিবারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর মতামতও গুরুত্ব পাচ্ছে। আগে পরিবারের অর্থনৈতিক দিক দেখাশোনা করত পুরুষরা, এখন পুরুষদের পাশাপাশি নারীরা নানান পেশায় জড়িত হচ্ছে। আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের অধিকাংশ শ্রমিকই নারী, তাঁরা প্রাপ্ত উপার্জন দিয়ে পরিবারের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। এ ছাড়াও অফিস-আদালত থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে। সামজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার কাঠামোর এই পরিবর্তন মূলত সমাজ পরিবর্তনের অংশ।

সমাজ কাঠামোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো, আমাদের দেশে যার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতি রুপান্তরিত হয়ে শিল্পনির্ভর হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৯০ সালে মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product) বা জিডিপিতে কৃষির অবদান ৩৩ শতাংশ থেকে কমে প্রায় ১৩ শতাংশ হয়েছে, অন্যদিকে জিডিপিতে শিল্পের অংশ ২১ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন কৃষিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন দল বা প্রতিষ্ঠান ক্রমে সংকুচিত হয়েছে, অন্যদিকে শহরের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে, সেইসঙ্গে এখানে নতুন নতুন দল ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ফলে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন হয়ে চলেছে। তাছাড়া দিনে দিনে বিদেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগের প্রভাব পড়েছে আমাদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে।

সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য কারণ হল দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আন্দোলন-সংগ্রাম। সমাজের মানুষ নানান শ্রেণিতে বিভক্ত এবং এ শ্রেণিগুলির মাঝে দ্বন্দ্বের কারণে সমাজের পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন শ্রেণির ভেতর দ্বন্দ্বের কারণ হললো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য। দ্বন্দ্বের ফলে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে পড়ে এবং নতুন সমাজব্যবস্থা বিকাশের পথ খুলে যায়।

ইতিহাসে আমরা অহিংস সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের উদাহরণ দেখতে পাই। সেসব আন্দোলনে আমরা ভারতের মহাত্মা গান্ধী ও যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন লুথার কীং জুনিয়ারের মত কিছু নেতার অসামান্য অবদান দেখতে পাই।

আমরা অনেকেই হয়তো মীনা কার্টুন দেখেছি। মীনা তার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা দিয়ে অনেক সামাজিক সচেতনতামূলক কাজ করেছে। নিজের এলাকার মানুষের অনেক প্রচলিত রীতি-নীতি ও অভ্যাস পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। আমরা মীনার একটি ঘটনার সারসংক্ষেপ সম্পর্কে জেনে নিই।

মীনার পরিচিত বড়োবোন তারাবু'র বিয়ে ঠিক করেছে, তার মা-বাবা। ছেলে শহর থেকে আসা দোকানদারের ভাইয়ের ছেলে। দোকানদার, তার ভাই ও ভাইয়ের ছেলে মিলে ঠিক করল বিয়েতে যৌতুক নেবে। গ্রামের মানুষ তখনো যৌতুক বন্ধের আইন সম্পর্কে জানে না। তাই তারা পরিকল্পনা করে বিয়ের আগে চাইবে সাইকেল, বিয়ের পরে চাইবে মোটরসাইকেল। তাঁদের এই পরিকল্পনার কথা জেনে যায় মীনার পোষা পাখি মিঠু। মিঠুর কাছ থেকে এটা জেনে মীনা ও রাজু তারাবু ও তার মা-বাবার কাছে এই তথ্য দেয়। তারা সবাই মিলে গ্রামের মাতবারের কাছে এই বিষয়ে জানতে চায়। মাতবার জানান যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া দুটোই অপরাধ। তাই গ্রামের সবাই মিলে ঠিক করে, যৌতুক চায় এমন কোনো ছেলের সঙ্গে তাঁদের বিয়ের যোগ্য কোনো মেয়েকে বিয়ে দেবে না। যৌতুক না পেয়ে শহর থেকে আসা এই ছেলে বিয়ে না করেই শহরে ফিরে যায়।

মিনা কার্টুন (যৌতুক)

আমরা একটু চিন্তা করলেই হয়তো বুঝতে পারব সমাজে প্রচলিত, যৌতুকপ্রথা বন্ধে মীনা গ্রামবাসীর সহায়তায় কীভাবে সফলভাবে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে গ্রামবাসীর মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলেছিল। যদিও এটি একটি গল্প। আমরা এমন কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে জেনে নিই যাঁরা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথা পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছেন।

সামাজিক আন্দোলন

সামাজিক আন্দোলন হলো একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র বা দেশের বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়। সামাজিক আন্দোলনের উৎপত্তি হয় সমাজে বিদ্যমান কোনো অসংগীতি বা বৈষম্যের প্রতি অসন্তুষ্টির ফলে। সুতরাং বলা যায়, বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন, অসংগীতি ও অসন্তোষ দূরীকরণ এবং শৃঙ্খলা আনয়নে মানুষের সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টাই সামাজিক আন্দোলন।

সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ ভারতে রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সতীদাহ প্রথা রোধ, ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহের প্রচলন হয়েছিল। পরবর্তী নারীশিক্ষা বিস্তার, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন বিলোপ ইত্যাদির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর নানা প্রান্তে গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সামজিক আন্দোলন চলমান রয়েছে।

এ পর্যায়ে আমরা কিছু সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে জানব, যেগুলো বিভিন্ন সময় বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, এবং সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

মার্টিন লুথার কীং এর বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন

যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত মানবাধিকার নেতা মার্টিন লুথার কীং জুনিয়র সারা জীবন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ও কৃষ্ণাঙ্গদের সম-অধিকার আদায়ে লড়াই করে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ১৯৫৫ সালে কীং ব্যাপটিস্ট চার্চের যাজক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি সরাসরি কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। সে বছরই মণ্টোগোমারিতে শুরু হয় ঐতিহাসিক বাস ধর্মঘট, যার সূত্রপাত হয় বাসের আসন বরাদ্দকে কেন্দ্র করে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের অধিকাংশ রাজ্যেই বাসের সামনের দিকে বসার অধিকার ছিল না কৃষ্ণাঙ্গদের। শ্বেতাঙ্গ যাত্রী উঠলে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছেড়ে দিতে হতো। কিন্তু এই নিয়ম মানতে অস্বীকার করলেন কৃষ্ণাঙ্গ নারী রোজা পার্কস। যা ছিল তৎকালীন আইনের লঙ্ঘন। রোজাকে থানায় নিয়ে ১০ ডলার জরিমানা করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে লুথার কীং ও অন্য কৃষ্ণাঙ্গ ধর্মযাজকেরা বাস সার্ভিস বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। টানা ৩৮১ দিন নানা প্রতিকূলতার পরেও কৃষ্ণাঙ্গদের সরকারি বাস বয়কট চলতে থাকলে সুপ্রিম কোর্ট বাসের আসন বন্টনের এই বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষণা করেন। অবশেষে বাসে সবার বসার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে গোটা আমেরিকায়। তাঁর এই অহিংস আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসেন বহু কৃষ্ণাঙ্গ নেতা। আমেরিকা জুড়েই বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেগে উঠতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় কীং ১৯৬৩ সালে সরকারের নেওয়া বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ঘোষণা করেন। এর মূল লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের শ্বেতাঙ্গদের সমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা দিতে হবে এবং শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে।

মার্টিন লুথার কীং

এক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশে আলাবামার পুলিশ সমবেত জনতার ওপর দমনমূলক নিপীড়ন চালায়। মার্টিন লুথার কীংসহ আরও অনেকে সে সময় গ্রেপ্তার হন। এই ঘটনা বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এরপর তিনি স্থির করেন, দেশজুড়ে শুরু করবেন ফ্রিডম মার্চ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুরু হয় ওয়াশিংটন অভিমুখে পদযাত্রা। ১৯৬৩ সালের ২৭ আগস্ট ওয়াশিংটনের লিঙ্কন মেমোরিয়ালে সমবেত হয় আড়াই লাখের বেশি মানুষ। তাঁদের সামনে ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন কীং, 'আমার একটি স্বপ্ন আছে' (আই হ্যাভ আ ড্রিম)। ভাষণে তিনি বলেন, কীভাবে বর্ণবৈষম্য গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তিনি তুলে ধরেন ভবিষ্যতের আমেরিকা নিয়ে তাঁর আশাবাদ। যেখানে সব আমেরিকান হবে সমান। এটাই হবে সত্যিকারের স্বপ্নের আমেরিকা।

তাঁর স্বপ্নের কিছু দিক এভাবে তিনি উল্লেখ করেন- 'বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের বলছি, বর্তমানের প্রতিকূলতা ও বাধা সত্ত্বেও আমি আজও স্বপ্ন দেখি। আমার এই স্বপ্ন আমেরিকান স্বপ্নের গভীরে শিকড়বদ্ধ। আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন এ জাতি জাগবে এবং তারা বাঁচিয়ে রাখবে এই বিশ্বাস যে আমরা সকল আমেরিকান স্বতঃসিদ্ধ ভাবে এই সত্যকে গ্রহণ করেছি যে, সব মানুষ সমান। আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন জর্জিয়ার লাল পাহাড়ে সাবেক দাস আর সাবেক দাস মালিকের সন্তানেরা ভ্রাতৃত্বের এক টেবিলে বসতে সক্ষম হবে। আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন মরূময় মিসিসিপি রাজ্য অবিচার আর নিপীড়নের ব্যবস্থা বন্ধ করে মিসিসিপি হয়ে উঠবে মুক্তি আর সুবিচারের মরুদ্যান। আমি স্বপ্ন দেখি, আমার চার সন্তান একদিন এমন এক জাতের মধ্যে বাস করবে, যেখানে তাঁদের চামড়ার রং দিয়ে নয়, তাঁদের চরিত্রের গুণ দিয়ে তারা মূল্যায়িত হবে। আমি আজ এই স্বপ্ন দেখি। আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন আলাবামা রাজ্যে, যেখানে গভর্নরের ঠোঁট থেকে কেবলই বাধা-নিষেধ আর গঞ্জনার বাণী ঝরে, সেখানকার পরিস্থিতি এমনভাবে বদলে যাবে যে, কালো-ধলো যাই হোক বালকেরা-বালিকাদের সঙ্গে ভাইবোনের মতো হাত ধরাধরি করবে। আমি আজ এই স্বপ্ন দেখি।' তাঁর এই বিখ্যাত ভাষণের প্রভাবেই কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৬৪ সালে আমেরিকায় নাগরিক অধিকার আইন ও ১৯৬৫ সালে ভোটাধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়। সেই বছর টাইমস পত্রিকা কীংকে বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে 'ম্যান অব দ্য ইয়ার' পুরস্কার দেয়। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য কীং ১৯৬৪ সালে মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

মার্টিন লুথার কীং সম্পর্কে দুটি কথা জানা প্রয়োজন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ধারণা তিনি পেয়েছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ মাহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে। দ্বিতীয় কথাটি দুঃখের, ১৯৬৮ সালে কীং আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন।

আমরা একটু ভেবে দেখলে দেখব বিদ্যালয়, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ চর্চা শিখি। অন্যদিকে সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন অথবা সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় সমাজের এই প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধেরও পরিবর্তন হতে পারে। তাই প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সামাজিক কাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলে, সেইসঙ্গে সামাজিক কাঠামো রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আমরা বিদ্যালয় থেকে নানান সময় বিভিন্ন সমাজ বা দেশ বা রাষ্ট্রের প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা এমন কয়েকটি রীতিনীতি ও মূল্যবোধের তালিকা তৈরি করব। এই জন্য আমরা এই শিখন অভিজ্ঞতার শুরুতে যে দলটি গঠন করেছি সেই দলেই আবার বসে যাব।

দলগত কাজ ২:

এখন আমরা দলগতভাবে আলোচনা করে নিচের তালিকাটি পূরণ করি। এজন্য আমরা বিদ্যালয়ের পাঠাগার থেকে শুদ্ধাচার বইটি সংগ্রহ করে নিতে পারি।

যে যে প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে আমরা বিদ্যালয় থেকে জানতে পেরেছি:

- **১.শিক্ষক ক্লাসে ঢুকলে দাঁড়িয়ে যাওয়া।**
- **২.ঐক্যবদ্ধ থাকা।**
- **৩.অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া না নেওয়া।**
- **৪.দেশকে ভালোবাসা।**
- **৫. পথশিশুদের খাবার দেওয়া।**
- **৬.বন্ধুদের সাথে খাবার ভাগাভাগি করে খাওয়া।**

এখন আমরা দলে আলোচনা করে নির্ণয় করি এই রীতিনীতি ও মূল্যবোধগুলোর কোনগুলো আমাদের সমাজে প্রচলিত নয়। এর মধ্যে কোনো রীতিনীতি ও মূল্যবোধ আমাদের সমাজেও থাকা প্রয়োজন। নির্ধারিত এই রীতিনীতি ও মূল্যবোধগুলো আমরা পরিবার, বিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কীভাবে চর্চা করতে পারি তা দলে আলোচনা করে লিখে রাখি। এরপর আমরা প্রতি দল থেকে ১-২ জন উপস্থাপন করব। সব দলের উপস্থাপনা শেষে সবার মতামতের ভিত্তিতে কয়েকটি রীতিনীতি ও মূল্যবোধ নির্ধারণ করি।

এই রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কোনো কোনো মাধ্যমে এবং কীভাবে চর্চা করতে পারি তার একটি গাইডলাইন তৈরি করি। এই গাইড লাইন অনুসারে সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে আমরা সারা বছর রীতিনীতি ও মূল্যবোধ চর্চার কাজটি করব।

অনুশীলনী: গাইড লাইন

নির্ধারিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ	কোথায় চর্চা করব	কীভাবে চর্চা করব
শিক্ষম ক্লাসে ঢুকলে দাঁড়িয়ে যাওয়া।	**বিদ্যালয়ে**	**শিক্ষকদের দাড়িয়ে সন্মান জানিয়ে।**
পথশিশুদের খাবার দেওয়া।	**রাস্তাঘাটে**	**পথশিশুদের খাবার দিয়ে।**
অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া না নেওয়া।	**বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট**	**অন্যের কোন কিছু না নিয়ে।**

আমরা খেয়াল করলে দেখব বিদ্যালয়ে যেমন সমাজের প্রচলিত ও মূল্যবোধ চর্চা হয় তেমনি বিদ্যালয় নতুন রীতিনীতি ও মূল্যবোধ গঠন ও প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখে। এভাবেই সামাজিক কাঠামোর ওপর প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধের প্রভাব রয়েছে। সেই সঙ্গে সামাজিক কাঠামো এই রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে।